ভারত পরিক্রমা

ক্ষিতিমোহন সেন

সম্পাদনা
প্রণতি মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

ভূমিকা

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী লেখার প্রয়োজনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা তাঁর প্রবন্ধগুলি মন দিয়ে পড়তে পড়তে সেগুলির ভাবসম্পদ, বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর গ্রন্থগুলি যে-সব বিষয়ে তাঁর গভীর চর্চা ও অনুসন্ধানের প্রমাণ দেয়, এই-সব প্রবন্ধগুলিতে সেই দিকগুলি ছাড়াও আরও নানা দিকে তাঁর জাগ্রত মনের পরিচয় ধরা পড়েছে। সেই থেকেই এগুলি সংকলনের সংকল্প মনে ছিল। পুনশ্চ প্রকাশন সংস্থার স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীসন্দীপ নায়ক এই সংকলন প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় নিশ্চিন্তমনে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। সেইমতো বিষয়ের ভিত্তিতে নির্বাচন করা ক্ষিতিমোহন সেনের একটি প্রবন্ধসংকলন গত বছর জানুয়ারিতে *সাধক ও সাধনা* নামে প্রকাশিত হয়। চুয়ান্নটি প্রবন্ধ ছিল তাতে। এবার দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচিত তাঁর প্রবন্ধসমুচ্চয় *ভারত পরিক্রমা* নামে যখন প্রকাশের মুখে, স্বভাবতই আনন্দিত আমি। ইচ্ছা হয়ে যা মনের মধ্যে ছিল, তা যখন চোখের সামনে রূপবান হয়ে ওঠে, গতি পায়, ভালো তো লাগবেই। এই সংকলনে আটান্নটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

ক্ষিতিমোহন সেনের গুটিকয়েক বই পুনর্মুদ্রিত হলেও তাঁর অধিকাংশ বই এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে আপাতত আমাদের লক্ষ্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকীর্ণ তাঁর প্রবন্ধগুলির সংকলন। তাই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি গ্রহণে বিরত থাকবারই চেষ্টা করেছি। ব্যতিক্রমও আছে, এদেশে ধর্মসাধনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার বিবিধ দিকে যখন এবং যেখানে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন, তখন সেখানে সৃষ্টির যে বিস্ময়কর ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে তার তুলনা নেই, এই মিলিত সাধনার প্রসঙ্গটি ক্ষিতিমোহনের অন্যতম প্রিয় বিষয়। বিশ্বভারতী থেকে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় *ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*। তার আগে এই গ্রন্থের প্রায় সব অধ্যায় প্রবন্ধাকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সাধন-ঐক্যের অমূল্য ইতিবৃত্তগুলি এই সংকলন থেকে বাদ দিতে মন চাইল না।

গ্রন্থ সম্পাদনায় পূর্বসংকলনের নীতিই অনুসৃত হয়েছে। প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি কয়েক ক্ষেত্রে আছে। কখনও কখনও দোঁহা বা তজ্জাতীয় উদ্ধৃতিতে ঈষৎ পাঠভেদ লক্ষ করা যায়। দু-একটি নামবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এরকম সামান্য পাঠভেদ আছে। সেগুলি সাধারণত যথাযথ রাখা হল। মূল মুদ্রিত প্রবন্ধের জীর্ণতাবশত কোনো বাক্যাংশের পাঠোদ্ধার অসম্ভব হলে অনিচ্ছাকৃত বর্জনচিহ্ন [...] ব্যবহার করেছি।

পত্রিকায় প্রকাশের কালানুক্রমে প্রবন্ধগুলি সাজানো হল। কিন্তু 'গুরু নানকের বসন্তোৎসব' কেন সেই রীতি ভেঙে সবশেষে স্থান পেল, সে-কথাটা বলা দরকার। এর স্থান হওয়া উচিত ছিল *সাধক ও সাধনায়*। জানি, বর্তমান সংকলনে প্রকাশকাল অনুসারে একে স্থান দিলেও বেমানান কিছু হত না। কিন্তু আমার অনবধানে ও যে স্বশ্রেণিচ্যুত হয়েছে, সে দুঃখ ভুলতে চাই না বলে *ভারত*

পরিক্রমায় যাত্রীদলের সবশেষে ওকে রাখলাম। কল্যাণীয় সন্দীপের কাছে অনুরোধ রইল, দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি যেন এই ত্রুটি সংশোধন করে এ প্রবন্ধ *সাধক ও সাধনায়* যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট করেন।

১৯৫৩ সালে দৈনিক বসুমতী শারদীয়ায় 'জগন্মাতার কাছে ভক্তের প্রার্থনা' নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেটি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অধরা থেকে গেল।

পরিণত বয়সে ক্ষিতিমোহন সেন বহু প্রবন্ধ লিখেছেন দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক (দোল) সংখ্যাতেও লিখেছেন। চৈতন্য লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি গ্রন্থাগার থেকে এ-সব প্রবন্ধের অনেকগুলি পাওয়া গেলেও সব পাওয়া যায়নি। আর আনন্দবাজার পত্রিকা দৈনিকে বিভিন্ন উপলক্ষে যে-রচনা তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল তার যৎসামান্যই নিজেদের চেষ্টায় উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। শ্রীযুক্ত অভীক সরকারের সহৃদয় সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের গ্রন্থাগার থেকে প্রত্যাশাতীত সাহায্য পেয়েছি। শ্রীযুক্ত অভীক সরকারকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের গ্রন্থাগারিক ও তাঁর সহকর্মীদের, যাঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই-সব প্রবন্ধের জেরক্সপ্রতিলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হল আমার পক্ষে। শ্রদ্ধেয় শ্রীনিখিল সরকার, কল্যাণীয় শ্রীপার্থ বসু এবং কল্যাণীয় শ্রীসুবীর মিত্রের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সম্যক কারণ আছে।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধের অনুলিপি করে দিয়ে আমাকে উপকৃত ও ঋণী করেছেন। কল্যাণীয়া শ্রীমতী মহুয়া বসুর কাছেও আমার একই ঋণ।

এই কাজের সর্বস্তরে যাঁর অপরিহার্য সহায়তা ও পরিশ্রমের স্পর্শ জড়িত আছে তিনি আমার ছাত্র কল্যাণীয় শ্রীঅভীককুমার দে। অন্তরবিত্তে তিনি নিত্যসম্পন্নতর হোন, এই প্রার্থনা করি।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

১লা অগ্রহায়ণ, ১৪১১

সূচিপত্র

ভারতশিল্পের ত্রৈগুণ্য	১১
ব্রাত্য	২১
মেঘের গান	৩২
কজলী	৩৬
মুসলমান কবিদের হোলি	৪৮
শ্রীকৃষ্ণ	৬০
আমাদের সমাজে নারীর স্থান	৭১
নবরাত্রির গান	৮৪
ভারতের দেবীপীঠ	৯৭
শিক্ষার স্বদেশি রূপ	১০৮
শক্তিসাধনা	১১৪
ভারতের বাহিরে হিন্দুতীর্থ	১৩০
সংস্কৃতির যোগসাধনা	১৩৯
রাম ও তাঁহার চরিত	১৪২
রাজস্থানে শক্তিপূজা	১৪৭
ভারতে বসন্তোৎসব	১৫৫
উৎসবময় দোলপূর্ণিমা	১৬৭
বলিদান	১৭৫
শক্তিপূজা	১৮২
শাশ্বত প্রতিষ্ঠা	১৮৭
সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ	১৯৩
চিনদেশে বৌদ্ধতীর্থ	১৯৫
ভারতের মানবতাধর্ম	২০৩
লোকায়ত মত	২০৯
ভারতের বসন্তোৎসব	২১৯
আদ্যাশক্তির আবাহন	২২৫
বৈদিক মন্ত্রে বসন্ত-আবাহন	২৩৩
উদারতার সৃষ্টিশক্তি	২৪১
ভারতে ধর্মের উদারতা	২৫৭
ভারতের চিত্রশিল্পে সাধনার যোগ	২৬৩

আমাদের স্থাপত্যশিল্পে যুক্তসাধনা ২৭১
জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা ২৭৭
দেবীপূজার বৈদিক মন্ত্র ২৮১
ভারতের সাহিত্য ও মুসলমানের সাধনা ২৮৭
বেদমন্ত্রে মাতৃপূজা ২৯৬
অখণ্ড ভারতের সাধনা ৩০১
শিক্ষায় স্বাধীনতা ৩০৭
ঋতু-উৎসব ৩১০
দেবীপক্ষের মাতৃপূজা ৩১৮
আয়াতু বরদা দেবী ৩২১
ভারতীয় সংগীতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা ৩২৫
বসন্তোৎসব-প্রশস্তি ৩৩৪
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর—'সাবধান সাবধান' ৩৪৩
স্বাধীনতার সাধনা ৩৫০
বসন্তোৎসবের আবাহন ৩৫৬
আয়াহি শক্তিরূপিণী ৩৬৩
জয় জয় শক্তিরূপিণী ৩৬৯
বসন্ত উৎসবের করুণ আহ্বান ৩৭৩
দেবী পূজার অনুধ্যান ৩৭৯
বৈদিক যুগ হইতে বসন্তোৎসবের ধারা ৩৮৫
ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের চিন্তাধারা ৩৯১
বিশ্বপ্রকৃতিতে ও ভক্তজীবনে বসন্তোৎসব ৩৯৬
বসন্ত সংবর্ধনা ৪০১
ভারতের সাম্য-মৈত্রীর সাধনা ৪০৪
নববর্ষপ্রশস্তি ৪০৯
দোল-পূর্ণিমা ৪১২
হোরী ৪১৭
সংস্কৃতির দায়িত্ব ৪২২
গুরু নানকের বসন্ত-উৎসব ৪২৭

ভারতশিল্পের ত্রৈগুণ্য

সাধারণত আমাদের দেশে শিল্পকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে-সব শিল্প আমাদের প্রয়োজনসকল বিধান করে তাহা কেবলমাত্র শারীর ভোগের বস্তু বলিয়া তামসিক।

যেমন, বেদে রথকারকে 'মনীষী কর্মকার' বলা হইয়াছে। 'যে রথকারাঃ কার্ম্মারাঃ যে মনীষিণঃ' (*অথর্ব* ৩,৫,৬)।

গৃহাদি-নির্মাতা তষ্টার কাজের উল্লেখ বেদের বহু স্থানে আছে। (*ঋক* ১, ৬১, ৪; ১, ১০৫, ১৮ ইত্যাদি ইত্যাদি)। বেদে কতবার যে তষ্টার গৃহনির্মাণশিল্পের উল্লেখ আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সমস্তই তামসশিল্প। এই শিল্পের দ্বারা আমাদের দেহরক্ষা ও প্রয়োজন নির্বাহ হয় মাত্র, ইহা দ্বারা কোনো যথার্থ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা চলে না। যেখানে শিল্প ধনী অথবা পুরোহিতদলের ফরমাইস-মতো বস্তু সৃষ্টি করে, সেখানে ইহাকে দাসশিল্পও বলা চলে। শিল্পনিকেতনের ইহা নীচের তলার সামগ্রী।

যে-সব শিল্পের দ্বারা আমাদের দেহরক্ষা বা প্রয়োজনসাধন হয় না, কিন্তু যাহাতে আমাদের বিলাসিতা, আমাদের ঐশ্বর্যের ও নৈপুণ্যের প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহা রাজসিক শিল্প। শিল্পী আপন ঐশ্বর্য ও শক্তির দ্বারা যেখানে সমস্ত সমাজের উপর প্রভুত্ব করে ও নিজের সৃষ্টির বৈভবে সকলের চমক লাগাইয়া দেয় সেখানে শিল্প রাজসিক। *বাজসনেয়ি সংহিতায়* (৩০, ৭) ও *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে* (৩,৪,৩,১) মণিকারের উল্লেখ আছে। *বাজসনেয়িতে* (৩০-১৭) ও *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে* (৩,৪,১৪,১) হিরণ্যকারেরও উল্লেখ আছে। ইহাদের সৃষ্ট শিল্প জীবনযাত্রানির্বাহে না লাগিলেও তাহা তখনকার ধনীদের বৈভব ও শিল্পীদের নৈপুণ্য প্রকাশ করিত। *ঋগ্বেদের* ১০ম মণ্ডলে ৮৫তম সূক্তে সূর্যার বিবাহে বধূর অলংকৃত-বেশ 'বাধূয়' উল্লিখিত আছে, তাহা পুরোহিতের প্রাপ্য। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* আছে যে বস্ত্রের আরম্ভে-মধ্যে-অবসানে যেমন নকাশী করা কাজ 'পেশস্' থাকিয়া বস্ত্রকে অলংকৃত করে, কাব্যের পক্ষে নিবিৎও সেরূপ। যেমন অলংকৃত বহুমূল্য বস্ত্র বুনিতে আরম্ভ করিলে 'হাশিয়া' দিতে হয়, তেমনি কাব্যের আরম্ভে নিবিৎ থাকা চাই। বস্ত্রের অন্তে যেমন 'হাশিয়া' দিতে হয়, কাব্যের শেষেও তেমনি নিবিৎ দিবে।

> পেশা বৈ উক্থানাম্ যন্নিবিদঃ।
> প্রবণয়তঃ পেশঃ কুর্য্যাৎ, মধ্যতঃ পেশঃ কুর্য্যাৎ,
> প্রজ্জনতঃ পেশঃ কুর্য্যাৎ। (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ৩,১,১০)

এই-সব শিল্প যদিও প্রয়োজনের সামগ্রী নহে, তবুও ইহা বিলাসের উপকরণ। কাজেই ইহাও সাত্ত্বিক শিল্প নহে। এই শিল্প রাজসিক। শিল্পনিকেতনের ইহা দোতলার কথা। শিল্পদেবতার প্রাঙ্গণ হইতে উঠিয়া দেবতার ভোগমন্দিরে বা নাটমন্দিরে এই শিল্প আসিয়া বসিতে পারে মাত্র। দেবগৃহে বা দেউলে প্রবেশ করিতে পারে না।

তবে সাত্ত্বিক শিল্প কী? অনন্তের জন্য সান্তের ব্যাকুলতা যে শিল্পের প্রাণ, সীমার মন্দিরে অসীমের আনন্দ যাহাতে বাজে, তাহাই সাত্ত্বিক শিল্প। অমৃতের জন্য মর্ত্যের যে নিত্যরাগ ও

নিত্যাভিসার, অরূপকে পাইয়া রূপের যে বিপুল আনন্দ, তাহাই সাত্ত্বিক শিল্পের প্রাণ, তাহাই তাহার সর্বস্ব। মানব যখন বিশ্বকে কেবলমাত্র জীবনহীন জড় তত্ত্ব মাত্র বলিয়া জানে না, যখন সে-সমস্ত বিশ্বকে আপনার জীবনে গ্রহণ করিতে চাহে, তখন সে বিশ্বকে রসরূপে পরিণত করে। রস— তরল, সদাস্পন্দিত, ভাবচঞ্চল রসই প্রাণসলিল। বৃক্ষ পার্থিব বস্তুকে রসে পরিণত করিয়া বাঁচে। সবই প্রাণরসে পরিণত করিয়া গ্রহণ করিয়া প্রাণী বাঁচে। তাই সাত্ত্বিক শিল্পীর কাছে এই পৃথ্বী জীবন্ত। তাহার সঙ্গে যোগ কেবলমাত্র জ্ঞানের নহে, তাহার সঙ্গে যোগ প্রেমের। 'পৃথিবী মাতা, আমি তাঁহার পুত্র' আথর্বণ এই মন্ত্র শিল্পরসের উৎস। আথর্বণেরা বিশ্বজগৎকে প্রাণবান বলিয়া জানিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহারা পৃথিবীকে প্রেমে আনন্দে নিশিদিন আলিঙ্গন করিয়া বিশ্বরস পান করিয়াছেন। তাই বিশ্বের প্রতি তাঁহাদের দরদের আর অন্ত নাই। সাত্ত্বিক শিল্পের ভিত্তি সেই বিশ্বপ্লাবী অমৃতরস। দাসশিল্প হইতে এইজন্যই সাত্ত্বিক শিল্প একেবারে স্বতন্ত্র। এ শিল্পকে কেবল আঁকিয়া বা গড়িয়া কর্তব্য শেষ করা চলে না, এই শিল্পকে জীবনে গ্রহণ করিতে হয়।

হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের মধ্যেও শিল্পের এই তিন বিভাগ স্বীকৃত হয়। তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিল্পেরও তিন রূপ। শ্রীকৃষ্ণ মল্লরূপে ও যোদ্ধা হইয়া শত্রু নিধন করিতেছেন, — তাঁহার এই রূপ তামসিক। তাঁহার ঐশ্বর্য মূর্তি মথুরার রাজসিংহাসনে— সে ঐশ্বর্য অতুল। এ তাঁর রাজসিক রূপ। কিন্তু তাঁর যথার্থ সাত্ত্বিকরূপ ব্রজের প্রেমধামে। তাঁহার এই রূপ প্রয়োজনের অতীত— এ যে লীলারস।

হিন্দুস্থানী বাউলেরা শিল্পের তিন রূপ বড়ো চমৎকার করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রসের প্রথম রূপ তামসিক— ধর, তাহা আঙুর। তাহা চোলাই করিয়া যখন উজ্জ্বল সুরা হইল, তখন তাহা ঐশ্বর্য রূপ— রাজসিক। আর তাহা পান করিয়া যে আনন্দ তাহা সাত্ত্বিক, তাহা বস্তু নহে, তাহা আনন্দ।

হাথমেঁ তেরা লাল চমকৌ মৈঁ অমীরস-প্যালা।
অন্দর তেরা জব সমাউ মস্তখুস মতবালা।।

'হে প্রাণস্বরূপ, তোমার হাতে যখন আমি অমৃতরসের পেয়ালা হইয়া চমকাই তখন আমার কি রাগ কি চমক! যখন আমি তোমার অন্তরে প্রবেশ করি তখন আমি তোমার নেশা, আমি তোমার আনন্দ।'

শিল্পী-আচার্য অবনীন্দ্রনাথও শিল্পের এইরূপ তিনটি ভাগ স্বীকার করেন।

প্রত্যেক সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তামসিক ও রাজসিক শিল্পটা আপনি গড়িয়া ওঠে। সাত্ত্বিক শিল্পটা গড়িয়া ওঠা তত সহজ নহে, ইহা কঠিন সাধনার ধন।

সহজ নহে কেন? তাহার কারণ এই, শিল্পের একদিকে রূপ, অন্যদিকে অরূপ। এই শিল্পে অরূপ রূপ পরিগ্রহ করে ও অরূপের রসসমুদ্রে রূপ ক্রমাগতই আপনাকে বিলীন করিতে থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় কোনো সভ্যতা বা রূপরসিক, কোনো সভ্যতা বা অরূপ তত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন। রূপ ও অরূপ এই দুইটি একসঙ্গে বড়ো মেলে না। অথচ এই দুইটি তত্ত্বের হরগৌরী মিলন না হইলে সাত্ত্বিক শিল্পের আশাই করা যায় না। তাই এই শিল্প বড়ো দুর্লভ।

ভারতীয় প্রাচীন আর্যজাতি অরূপের ধ্যানেই নিমগ্ন। তাঁহাদের মন রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অতীত পরব্রহ্মের প্রতিই স্বভাবত ধাবিত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের মন্ত্র 'অশব্দ-মস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' 'পরো দিবা পরঃ পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি। 'তাঁহার রূপ রস স্পর্শ শব্দ ও বিকার নাই। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া আছেন।'

আবার এদেশের আর্যদের অপেক্ষাও প্রাচীন ভারতীয় যে অনার্যগণ, তাঁহারা ছিলেন রূপের উপাসক। অনার্যদের মধ্যে কোনোকোনো শ্রেণী খুবই সভ্য ছিলেন। তাঁহারা নানাবিধ মূর্তি গড়িতেন ও নানাবিধ প্রতিমা পূজা করিতেন। এখনও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে অনার্য স্থপতিগণের গোপুর মন্দিরাদি যেমন চমৎকার, তেমনি বিরাট। প্রাচীন আর্যদের সভা আসিয়া করিত দানব ময়- পুরীকে কি অদ্বিতীয় ঐশ্বর্যসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল রাবণ। এই-সব ইঙ্গিতে বুঝিতে পারি যে প্রাচীন অনার্যগণ খুবই রূপরসিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তামসিক ও রাজসিক শিল্পই ক্রমাগত বিকশিত হইতেছিল। কিন্তু অনন্তের ভাবটুকু তাঁহাদের অন্তরে না থাকাতে সে শিল্পটি সাত্ত্বিক হইয়া ওঠে নাই। কাজেই যেই আর্যেরা আসিলেন, অমনি একটি গঙ্গা-যমুনা মিলন ঘটিল। রূপ ও ধ্যানের ধারা মিলিয়া একটি অপূর্ব রসতীর্থের সৃষ্টি হইল।

এইজন্য শিল্পের মালমশলা *অথর্ব* ও পরবর্তী বৈদিক যুগে যেমন মেলে, *ঋগ্বেদে* তেমন মেলে না, তখনও আর্য-অনার্য তেমন মিশ খায় নাই। *অথর্বে* ও পরবর্তী বৈদিক যুগে এই রস বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এখন এ-কথা জিজ্ঞাস্য যে জয়ী আর্যেরা পরাজিত ও অপসারিত অনার্যদের কাছে রূপ-রাগ নিতে যাইবেন কেন? কিন্তু দেওয়া-নেওয়ার শাস্ত্র বড়ো চমৎকার। কিছু দিবার থাকিলে পরাজিতও তাহা দেয় এবং নিবার থাকিলে জেতাও তাহা নেয়। কিছুতেই ইহার অন্যথা হয় না। যেখানে যেখানে দৈন্য আছে, সেখানে জেতাকেও পরাজিতের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেই হয়। জেতা রোমকেরা গ্রিসের সভ্যতা নিতে বাধ্য হইল। ভারতের আর্যেরাও পরবর্তী জেতাদিগকে দিয়াছে বিস্তর। সর্বত্রই এইরূপ ঘটিয়াছে।

অথর্ববেদে যে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর স্তব ও ব্রতহীন মানবের স্তব (ব্রাত্যকাণ্ড) করা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারি যে তাহাদের মধ্যে আর্যপ্রভাব ছাড়া আরও প্রভাব আসিয়া জুটিয়াছিল।

মূর্তি প্রভৃতি পূজা অনার্যদেরই ছিল বলিয়াই স্মৃতির যুগেও গ্রাম্য দেবতা ও দেবল ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধেয় ছিল। মূর্তি পূজায় নানা ভাবেই অনার্য-প্রভাব অনুভব করা যায়। *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* (২২অ) আছে দেবীপূজায় স্ত্রীলোককে অতিশয় অশ্লীল গানের দ্বারা সকলকে তুষ্ট করিতে হইবে। পুরাণে বহু স্থলেই পাই রাজারা দণ্ড দিয়া বেদবাহ্য দেবতার মূর্তির পূজা ও বেদগান ছাড়া সাধারণের পূজ্য দেবতার ও প্রাকৃতজনের গান বন্ধ করিয়াছেন (*লিঙ্গপুরাণ*, উত্তরখণ্ড, ৩০ অ)। যে তন্ত্রে মূর্তির লক্ষণ ও ধ্যানাদি বহুলভাবে আছে সেই তন্ত্রের প্রভাব দক্ষিণ দ্রাবিড়াদি দেশেই বেশি। তাহা প্রায়ই রাবণপ্রোক্ত। *অগ্নিপুরাণের* মতে স্থাপত্যবিদ্যা *হয়শীর্ষতন্ত্র* হইতে গৃহীত। *হয়শীর্ষতন্ত্র* অনার্য তন্ত্র। প্রবন্ধান্তরে এই-সব আরও ভালো করিয়া আলোচনা করা যাইবে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে অনার্যদের মূর্তিবিদ্যা ও মূর্তিশিল্প ছিল, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়াতীত ধ্যানরস ছিল না, তাহা ছিল আর্যদের। এই দুইয়ের মিলনে ভারতে একটি অপূর্ব সাত্ত্বিক শিল্পের আয়োজন হইয়া উঠিতেছিল। পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর প্রতি দরদই শিল্পের প্রাণ, তাহা ক্রমশ আর্যদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল।

প্রাণে যেমন জড় 'দেহ' এবং দেহাতিরিক্ত অনির্বচনীয় 'জীবন' থাকে, তখনকার ভারতীয় প্রতিভায় তেমনি বিশ্বের সবই জীবনের দ্বারা জীবন্ত হইয়া প্রাণরসে পরিণত হইতেছিল। তাঁহাদের কাছে কিছুই জড় ছিল না, সবই প্রাণ।

প্রাণায় নমো যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে।।
নমস্তে অস্ত্বায়তে নমো অস্তু পরায়তে।

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।

(*অথর্ব*, ১১, ৬, ১-১২)

'প্রাণকে নমস্কার যাঁহাতে সব প্রতিষ্ঠিত। যে প্রাণ ক্রন্দন করিতেছেন সেই প্রাণকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, যে প্রাণ (জীবনরূপে) আসিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, যিনি (মৃত্যুরূপে) যাইতেছেন সেই প্রাণকে নমস্কার। মৃত্যুও প্রাণ, বেদনাও প্রাণ, দেবতারা এই প্রাণকে উপাসনা করেন। প্রাণই বিরাট, প্রাণই সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই প্রাণকেই সকলে উপাসনা করেন।'

যৎ প্রাণ ঋতা বাগতে অভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
সর্বং তদা প্রমোদন্তে যৎকিঞ্চ ভূম্যামধি।
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
অভিবৃষ্টা ওষধয়ঃ প্রাণেন সমবাদিরন্।।
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতিচীনায় তে নমঃ।। (ওই, ১১, ৬,, ১-১২)

'নিয়মিত ঋতু আসিয়া উপস্থিত হইলে যেই প্রাণ ওষধিসমূহের দিকে ক্রন্দন করে (ওষধিসমূহকে ব্যথিত আহ্বান করে) অমনি এই ভূমির উপর যাহা কিছু আছে সবই প্রমোদিত হইয়া উঠে। যখন প্রাণ এই মহতী পৃথিবীকে প্রাণরসের দ্বারা প্লাবিত করে, তখন রসসিক্ত ওষধিসকল প্রাণের দ্বারাই মধুর ছন্দে প্রত্যুত্তর দেয়। হে প্রাণ, তুমি নিত্য প্রাচীন, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্য নবীন, তোমাকে নমস্কার।'

যে ভাবরস বিশ্বচরাচরকে প্রাণিত করিয়া জীবন্ত করিয়া প্রেমে আপন করিয়া দেখিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ প্রয়োজনাতীত। প্রয়োজনের অতীত এই ভাবরস প্রেমরস কেবল সৌন্দর্যে শিল্পে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছিল।

আথর্বণ ও অঙ্গিরসদের মধ্যে বিশ্বের প্রতি প্রীতি, পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ, মানুষের হৃদয়ের দিকে টান অত্যন্ত বেশি। তাই তাঁহাদের মধ্যে বশীকরণ অভিচার প্রভৃতির মন্ত্রাদি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবী তাঁহাদের কাছে বেশি সত্য। পৃথিবীর মাটিতেই তাঁহাদের আনন্দ। কাজেই ইঁহাদের কাছে শিল্পের মালমশলা বেশি মেলে।

পৃথিবীর প্রতি তাঁহাদের এই দরদেই শিল্পের ভিত্তি। *অথর্ববেদে* এই দরদের অন্ত নাই। এই পৃথিবীকে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। বর্ণের রসের আনন্দের এই বৈচিত্র্যে আথর্বণদের হৃদয় শিল্পদেবীর পাদপীঠ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ ও রূপবৈচিত্র্যে আথর্বণ ঋষিরা মুগ্ধ। মহীকে তাঁহারা স্তব করিয়া বলিতেছেন :

গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽ হতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্। (ওই ১২, ১১)

'হে পৃথিবী, তোমার গিরি, তোমার তুষারাবৃত পর্বত, তোমার অরণ্য আমার সুখকর হউক। এই ধ্রুবা ভূমিই বভ্রুবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অরুণবর্ণ, বিচিত্ররূপা। এই দেবরক্ষিত ভূমির উপর অর্জিত অহত অক্ষত হইয়া আমি প্রতিষ্ঠিত আছি।'

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
ত্বাভি নিষীদেম ভূমে। (ওই, ১২, ১১,২৯)

'ভূমি আমার মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র। হে ভূমি, আমি তোমার কোলে যেন বসিতে পারি।'

যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেভ্য উদ্যনৎ সূর্যো রশ্মিভিরাততনোতি।

(ওই, ১২, ১)

'যেই মর্ত্যগণের জন্য সূর্য উদিত হইয়া স্বীয় আলোকে জ্যোতি-অমৃত ছড়াইয়া দেন।'

যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মাং সুরভিং কৃণু।।

(ওই ১২, ১, ২৩)

'হে পৃথিবী, তোমার যে গন্ধ ভরিয়া উঠিয়াছে, ওষধিসকল ও সলিল যে গন্ধে ভরপূর, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ যে গন্ধের ভাগ গ্রহণ করিয়াছে, সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর।'

যস্তেবিগন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ পৃথিবিগন্ধমগ্রে
তেন মাং সুরভিং কৃণু। (ওই, ১২, ১৩)

'তোমার যে গন্ধ পদ্মের মধ্যে আবিষ্ট, হে পৃথিবী, যে গন্ধ তোমার আদিতে, সেই গন্ধে আমাকে সুরভিত কর।'

শিলাভূমিরশ্মাপাংসুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ।। (ওই, ১২, ১)

'তোমার শিলা, তোমার ভূমি, তোমার পাষাণ, তোমার ধূলি সবাই যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই হিরণ্যবক্ষ মাতা পৃথিবীকে নমস্কার করি।'

গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবী নো দুহাতাম্। (ওই, ১২, ১,৩৬)

'হে মাতা ভূমি, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা, তোমার শরৎ-হেমন্ত, শিশির-বসন্ত। তোমার সুবিন্যস্ত ঋতু, সংবৎসর, তোমার দিবা ও রাত্রি তোমার বক্ষের দুগ্ধধারার ন্যায় ক্ষরিত হউক।'

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ।। (ওই, ১২, ১)

'কর্মকোলাহলে নিমগ্ন মর্ত্যগণ যে ভূমিতে গান করিতেছেন নৃত্য করিতেছেন, যাহাতে যুদ্ধের নিনাদ ও দুন্দুভির ঘোষণা বাজিয়া উঠিতেছে, সেই ভূমি আমাদের কল্যাণ করুন।'

যাং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সংপতন্তি হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
যস্যাম্ বাতো মাতরিশ্বেয়তে রজাংসি কৃণ্বং শ্চ্যাবয়ংশ্চ বৃক্ষান্।

(ওই, ১২, ১)

'যাঁহাতে হংস, সুপর্ণচিল, শকুন্ত ও ছোটো বড়ো সব পক্ষীগণ উড়িয়া চলিয়াছে, যাঁহাতে বায়ু ধুলা উড়াইয়া বৃক্ষগণকে দোলাইয়া মায়ের অন্তরের নিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।'

যামন্বৈচ্ছদ্ধবিষাবিশ্বকর্মান্তরর্ণবে রজসি প্রবিষ্টাম্।
ভুজিষ্যং পাত্রংনিহিতং গুহা যদাবির্ভোগে অভবন্মাতৃমদ্ভ্যঃ।।

'যেই মাতা পৃথিবী অর্ণব ও বাষ্পের মধ্যে ডুবিয়াছিলেন, বিশ্বকর্মা যাঁহাকে আহুতিমন্ত্রে অন্বেষণ করিতেছিলেন, গভীর গুহার মধ্যে নিহিত সেই আনন্দময় ভোগ্যপাত্রখানি মাতৃবান সন্তানগণের ভোগের নিমিত্ত আবির্ভূত হইল।'

ভূমে মাতর্ণিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।। (ওই, ১২, ১) 'হে মাতা পৃথিবী, তুমি আমাকে কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।'

জলের ধারা যেমন কোনো উৎস হইতে উৎসারিত হয় এই সৃষ্টিও যেন একটি রসধারা যে উৎস হইতে এই ধারা উৎসারিত হয় তাহা জীবন্ত। তাহাকে আথর্বণগণ স্কম্ভ নামে অভিহিত